কলকাতার ট্রাম

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

কলকাতার ট্রাম যেন এক কর্মক্লান্ত, জরাক্লিষ্ট বৃদ্ধ। তার দেড়শো বছর বয়সি থুত্থুড়ে দুরবস্থা দেখে কল্পনা করা কঠিন, গত শতাব্দীর ষাটের দশক অবধি তার কেমন অটুট আভিজাত্য ছিল, ছিল কেমন অপ্রতিহত গতি। বস্তুত কলকাতার ট্রাম নিয়ে এই সময় আলোচনা করতে গেলে মনে পড়বে শুধু তার উজ্জ্বল অতীতের কথাই; কারণ তার বর্তমান দীর্ঘশ্বাস-দীর্ণ; আর বিশেষজ্ঞরা হিসেব কষে মাথা নাড়েন, ভবিষ্যতও তো তেমন কিছু দেখছি নে!

টগবগিয়ে ট্রাম চলেছে

বলশালী অথচ দ্রুতগামী, তেজি অথচ পোষ্য—এমন সহজলভ্য প্রাণী বলতে প্রথমেই মনে পড়ে ঘোড়ার কথা। তাই মানুষ বা বলদে টানা গাড়ি ছেড়ে মানবসভ্যতা অশ্ববাহিত শকটের কথা ভেবেছে। সেই সূত্রে একে একে এসেছে রথ, ঘোড়ার গাড়ি এবং তারপর বহুজনকে বহন করার মতো বাহন হিসেবে ট্রাম। সামাজিক ইতিহাস চর্চায় বিশিষ্ট গবেষক শ্রীপান্থ তাঁর ‘কলকাতা’ গ্রন্থে কিছুটা কাব্যিক ভাষায় লিখেছেন, “বাসের মতো ডাঙার পাখি নয় ট্রাম। পথে পথে এর উড়ে চলার ইতিহাসটা লিখিত ইতিহাস। ইস্পাতে লেখা। টায়ারের পাটি-বোনা ছাপ পায়ে পায়ে মুছে যায়, করপোরেশনের জলের তোড়ে ধুয়ে যায় আমাদের মতো নাগরিকের ক্লান্ত পায়ের স্বাক্ষরও। কিন্তু ট্রাম থাকে।” অর্থাৎ শহরের পথে বাস, মোটরগাড়ি, পথচারীদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে ইস্পাতের রেললাইন বসিয়ে তার ওপর দিয়ে চালানো হয় যে-চাকা লাগানো বগি তাকেই ট্রাম বলা হয়।

বিদ্যুৎ ব্যবহার শুরু হওয়ার প্রায় সোয়া দুই শতক পূর্বে প্রথম ট্রামগাড়ি চালানো হয় ঘোড়া দিয়ে। ১৮০৭ সালে ব্রিটেনের ওয়েলস্ শহরে প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলে। বছর কুড়ি পর নানা কারণে বন্ধ হয়ে যায়। আবার ঘোড়া জুটিয়ে জোর কদমে শুরু হয় ১৮৬০ থেকে। আর তার কিছু বছর পরেই কলকাতা শহরের সাহেব অভিভাবকদের মাথায় আসে ঘোড়ায় টানা ট্রামের কথা।

শিয়ালদহে তখন রেলের নিয়মিত আনাগোনা। পল্লীগ্রাম থেকে সেখানে নানা মালপত্র এসে চলে যাচ্ছে গঙ্গাতীরবর্তী ব্যবসাকেন্দ্রগুলিতে—চিৎপুর, শোভাবাজার, আহিরিটোলা। সেকালে কলকাতা

চিকিৎসক, গবেষক ও সাহিত্যিক

ব্যবসায়ীদের পীঠস্থান। বিবিধ মালের ক্রমবর্ধমান পসরা কীভাবে বয়ে নিয়ে গিয়ে ব্যবসাকেন্দ্রে গুদামজাত করা হবে তা নিয়েই তখন নগরকর্তাদের মূল মাথাব্যথা। তাই যাত্রীদের কথা ভেবে নয়, মাল পরিবহণের উদ্দেশ্যেই কলকাতা ট্রামের পত্তন। প্রাথমিকভাবে শিয়ালদহ থেকে বউবাজার-ডালহৌসি স্কোয়ার হয়ে, কাস্টমস হাউসের ভেতর দিয়ে স্ট্র্যান্ড রোড ধরে আর্মেনিয়ান ঘাট (যা তখন হাওড়ায় ইস্ট ইন্ডিয়া রেলের কলকাতা স্টেশন) অবধি তার গন্তব্য স্থির হয়। উদ্দেশ্য, হাওড়া ব্রিজ-পূর্ব সেইসময়ে শিয়ালদহ থেকে হাওড়া স্টেশনে পণ্যদ্রব্য বহন করা। মাত্রই মাইল দুয়েক পথ। বাংলা গভর্নমেন্ট ইস্পাতের লাইন পাতার জন্য বরাদ্দ করলেন এক লক্ষ টাকা। কলকাতা কর্পোরেশনে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব তখন ছিল কিছু সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট শহরবাসীর ওপর—তাঁদের বলা হত 'জাস্টিস'। তাঁরা ভাবলেন মূল জনবসতির মধ্যে না ঢুকলে ট্রাম পরিষেবা ডাহা লোকসান খাবে, তাই তাঁরা গন্তব্যপথকে টেনে নিয়ে এলেন জনবসতির মধ্য দিয়ে চিৎপুর অবধি। তাতে লাইন বসানোর খরচ শুধু যে বেড়ে দাঁড়াল প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা তা-ই নয়, এই সিদ্ধান্তের ফলে ট্রাম চলার প্রথম দিন থেকেই সৃষ্টি হল এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির। ঘটনাটির কিঞ্চিৎ বিশদ বর্ণন প্রয়োজন। তারিখটি ছিল ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩। পথ চলা শুরু কলকাতা তথা গোটা এশিয়ার প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রামের। সকাল থেকেই শিয়ালদহ স্টেশনে কৌতূহলী সাধারণ মানুষের ভিড়, কারণ আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল এই দিন কলকাতায় ট্রাম পরিষেবা শুরু হবে। ট্রামওয়ের সুপারিন্টেনডেন্ট মিস্টার সি. এফ. অ্যাবরো এবং ইঞ্জিনিয়র মিস্টার ক্লার্ক সকাল থেকে হন্তদন্ত হয়ে সব তদারকি করছেন। সকাল সোয়া নটা বাজতে না বাজতে একটি প্রথম শ্রেণির এবং একটি দ্বিতীয় শ্রেণির বগি এসে দাঁড়াল। দুটিতেই দুটি করে তেজি ঘোড়া বাঁধা। প্রত্যেক বগিতে ৪৫ জনের বসার ব্যবস্থা। ধীরে ধীরে প্রতিদিনের মতো ইস্টবেঙ্গল রেলের একটি ট্রেন এসে পৌঁছল শিয়ালদহ স্টেশনে। আজ ট্রেনে গ্রাম থেকে আসা সবজি ও অন্যান্য মাল সহজে পরিবহনের জন্য ট্রামগাড়ি প্রস্তুত। কিন্তু হায়, যে-বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির কথা বলছিলাম : মালপত্র কোথায় পড়ে রইল, ট্রেন এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে যাত্রীরা প্রবল ঢেউয়ের মতো এসে আছড়ে পড়লেন ট্রামের বগিতে। আসন ভর্তি হল, বগির ভেতরে আর তিলধারণের স্থান নেই, তাই বাকি যাত্রীরা ছাদে উঠে পড়লেন, পাদানিতে কোনওক্রমে ঝুলে রইলেন, তার পরেও বহু যাত্রী না উঠতে পেরে ঠেলাঠেলি করতে লাগলেন। এই সবই ঘটল দ্বিতীয় শ্রেণির কামরাটিতে। আর প্রথম শ্রেণির কামরায় মাত্র পাঁচ জন যাত্রী : তিন ইউরোপীয় আর দুই ভারতীয়।

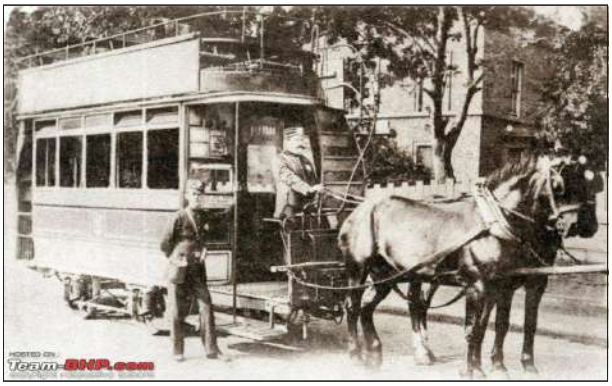

ঘোড়ায় টানা ট্রাম : ১৮৭৩

তাই সাড়ে নটা নাগাদ যখন সিগন্যাল দেওয়া হল তখন সেই খাঁ খাঁ প্রথম শ্রেণির বগি নিয়ে দুই তাগড়া ঘোড়া টগবগিয়ে যাত্রা শুরু করল, কলকাতার বুকে এক ইতিহাস সৃষ্টি হল। কিন্তু মিনিট কয়েক পরেই সেই ইতিহাসের গায়ে লেগে গেল কালিমাও।

কারণ মানুষ-উপচানো দ্বিতীয় শ্রেণির বগিটিকে টানতে পারল না দুই তেজি ঘোড়া। শপাং শপাং চাবুক চলল ঘোড়ার পিঠে, ট্রাম কোম্পানির কর্মচারীরা গাড়ি ঠেলতে লাগলেন। ধীরে ধীরে গাড়ি অবশেষে পৌঁছল গন্তব্যে। সেই সঙ্গে বুঝিয়ে দিল, কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনায় অনেক ফাঁক রয়ে গেছে।

আসলে আড়ে-বহরে ক্রমবর্ধমান কলকাতা শহরে মানুষের সংখ্যা তখন ক্রমশ বাড়ছিল—কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে আসছিলেন নানা আর্থ-সামাজিক স্তরের মানুষ, তাছাড়া কাজের সূত্রে শহরতলি বা পল্লীগ্রাম থেকে কলকাতায় যাতায়াতও করছেন অনেক অফিসবাবু, ব্যবসায়ী, শ্রমিক ইত্যাদি। তাঁদের যাতায়াতের জন্য কিঞ্চিৎ মহার্ঘ্য পালকি আর হ্যাকনি কারেজ। এমন বিলিতি নামে অবশ্য বাঙালি তাকে বিশেষ চিনত না, বলত ছ্যাকড়া গাড়ি। নামকরণেই মালুম, তার প্রতি কিঞ্চিৎ অশ্রদ্ধাই রয়েছে। আসলে এই গাড়ির মালিকদের পক্ষে হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়া কেনা সম্ভব হত না। তাঁরা বিত্তবান কলকাতাবাসীর সুদৃশ্য দশফুকার বা আটফুকার টেনে টেনে ক্লান্ত, অকেজো-প্রায় ঘোড়াগুলোকে অল্প দামে কিনে এই ছ্যাকড়া চালাতেন। তাতে না ছিল গতি, না ছিল একসঙ্গে অনেককে বহন করার ক্ষমতা—চার থেকে বড়জোর ছয় জন। সুতরাং সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজন ছিল এক সুষ্ঠু, সুলভ গণপরিবহনের। সেই চাহিদাকে অগ্রাহ্য করে শুধু মালবহনের কথা ভাবতে গিয়েই কর্তৃপক্ষ ভুল করেছিলেন।

সেই ভুলের মাশুল দিতে অকাল মৃত্যুবরণ করল কলকাতা ট্রাম পরিবহনের প্রথম উদ্যোগ। ভ্যাপসা গরম আর অতিরিক্ত ভারবহন করতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ান তেজি ঘোড়াও কাহিল হয়ে পড়ছিল, নিয়মিত ব্যবধানে মারা পড়ছিল মহার্ঘ্য সেইসব অবোলা প্রাণী। আর সেই কারণে প্রবল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের লোকসান হচ্ছিল সেই আমলে মাসে প্রায় ৫০০ টাকা করে। সরকার কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হল না। ফলে মাত্র ন-মাসের মাথায় ২০ নভেম্বর ১৮৭৩ গুটিয়ে ফেলতে হল ব্যবসা। ঠিক হল ট্রামের লাইন, গাড়ি সব বিক্রি করে দেওয়া হবে।

অথচ সাধারণ মানুষের মধ্যে ট্রামগাড়ির চাহিদা তখন তুঙ্গে। এই বিপুল ব্যবসায়িক সম্ভাবনার কথা বুঝতে পেরে এগিয়ে এলেন তিন সাহেব ব্যবসায়ী : ডিল্লেয়েন প্যারিস, আলফ্রেড প্যারিস আর মিস্টার চোটার। তাঁরা অভিজ্ঞ মাথায় কলকাতার ট্রাম নিয়ে বহু পরিকল্পনা করলেন, তৈরি করলেন 'ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি'। এই কোম্পানিই স্বাধীন ভারতবর্ষে ট্রাম জাতীয়করণের আগে অবধি কলকাতায় ট্রাম চালানোর দায়িত্ব সামলেছে।

প্রথমবারের উদ্যোগ মুখ থুবড়ে পড়ার ঠিক সাত বছরের মাথায় ১ নভেম্বর ১৮৮০ নতুন উদ্যমে শুরু হল এই দ্বিতীয় পর্যায়ের ট্রাম। নতুন কোম্পানি অস্ট্রেলিয়া থেকে নিয়ে এল ওয়েলার ঘোড়া, তৈরি করল নতুন মডেলের সুদৃশ্য ট্রামগাড়ি। প্রাথমিকভাবে রুট ঠিক হল : শিয়ালদহ থেকে উত্তর দিকে চিৎপুর হয়ে কুমারটুলি; পূর্বে বউবাজার স্ট্রিট হয়ে কাস্টমস হাউস, দক্ষিণে রসা রোড হয়ে কালীঘাট। তৃতীয় রুটটি প্রধানত হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কথা মনে রেখে তৈরি। এই কালীঘাটেই অনেকটা জায়গা ঘিরে তৈরি হল ট্রামগাড়িগুলো রাখা ও মেরামতির জায়গা—কালীঘাট তাই কলকাতার প্রাচীনতম ট্রামডিপো। চার বছরের মধ্যে ১৮৮৪ সালে কোম্পানি তার ঘোড়া-ট্রামের আওতায় নিয়ে এলো কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি : চৌরঙ্গী, ধর্মতলা, খিদিরপুর, ওয়েলেসলি। পরিচালক হিসেবে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব দেওয়া হল মার্টিন ওয়েলস সাহেবকে। কিন্তু দেশবাসীর সঙ্গে যাতে যোগাযোগ অটুট থাকে তাই এই দুঁদে সাহেবি কোম্পানি তার

পরিচালন উপসমিতিতে রাখল বিশিষ্ট দেশীয়দের। তুমুল ব্যস্ততা সত্ত্বেও ১৮৮৯-৯০ সালে এই সাবকমিটিতে ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুষ্ঠু ব্যবসায়িক বুদ্ধিতে ভরসা করে ১৯০০ সালে কলকাতার বুকে ১৯ মাইল জুড়ে ট্রামলাইন পাতা হল, তার ওপর দিয়ে ১৮৬ টি ট্রাম দৌড়ত, গড় হিসেবে বছরে প্রায় ১৩০ লক্ষ যাত্রী ট্রামে চাপতেন।

ইতোমধ্যে ১৮৮০-র দশকে ক্রাইস্টচার্চ, সিডনি, মিউনিখ প্রভৃতি কয়েকটি শহরে স্টিম-ইঞ্জিন চালিত ট্রাম চালু হওয়ায় কলকাতার কোম্পানি চৌরঙ্গী-খিদিরপুর রুটে পরীক্ষামূলকভাবে বাষ্পবাহিত ট্রামও চালু করেছিল। তবে ঘোড়ার ট্রামের তুলনায় বেশি খরচসাপেক্ষ হওয়ায় এবং বাষ্প নির্গমনের ধোঁয়া আর আওয়াজে মানুষের শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার অভিযোগ ওঠায় সেটি ব্যবসায়িকভাবে তেমন সফল হয়নি।

কেমন ছিল ঘোড়ায় টানা ট্রাম যাত্রা? ক্ষিতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর তাঁর 'কলিকাতায় চলাফেরা' গ্রন্থে সরস স্মৃতিচারণ করেছেন, "গ্রীষ্মকালে ট্রাম-গাড়িতে অফিসে যাতায়াতের সময় নিতান্ত স্বর্গসুখ যে পাওয়া যাইত না, তাহা বলা বাহুল্য। সকলেই তো অফিসে যাইবার বা গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত, কাজেই সাধ্য থাকিলে কেহই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে চাহিত না, সকলেই গাড়ীতে উঠিবার জন্য হুড়াহুড়ি লাগাইত—ঘোড়ার গাড়ী তো—তেমন জোরে চলিত না।... গ্রীষ্মকালে ঘর্মাক্ত- কলেবর দণ্ডায়মান আরোহীদিগের কল্যাণে উপবিষ্ট আরোহীদিগের যে কি অবস্থা হইত, তাহা ভুক্তভোগীর বর্ণনা অপেক্ষা পাঠকদিগের কল্পনাদৃষ্টিতে দেখাই ভাল।"

পূর্ণেন্দু পত্রী তাঁর 'কলকাতা সংক্রান্ত' গ্রন্থে ক্ষিতীন্দ্রনাথের ট্রামযাত্রা সম্পর্কিত আরও কিছু মন্তব্য উদ্ধার করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি নিজে এক আশ্চর্য স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি বিচার করেছেন : "ঘোড়ায়-টানা ট্রাম এক অর্থে কলকাতার নাগরিক জীবনে নিয়ে এল এক মৌলিক রূপান্তর। পালকি, ল্যান্ডোলেট, ব্রুহাম, ছ্যাকড়া ইত্যাদি মিলিয়ে তখনকার যানবাহন প্রধানত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। অথবা পরিবারভিত্তিক। অপরদিকে ভাড়ার যানবাহনেও ব্যক্তি অথবা পরিবারের আধিপত্য। ঘোড়ায়-টানা ট্রাম তার প্রথম যাত্রার দিন থেকেই জাতিধর্মশ্রেণী নির্বিশেষে একটি যানের মধ্যে উন্মুক্ত করে দিল জনসাধারণের যৌথ যাত্রার এক অকল্পনীয় সুযোগ ও অধিকার। কলকাতার ট্রান্সপোর্টে আচম্বিতে এক অবিশ্বাস্য ডেমোক্রেসী।"

বিদ্যুদ্‌বেগে

বাষ্প ছাড়াও শক্তির আরও নানা উৎস ব্যবহার করে ট্রাম চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে পৃথিবী জুড়ে : কয়লা গ্যাস, ন্যাপথা গ্যাস, ব্যাটারি, হাইড্রোজেন, পেট্রল। সেইসব স্বল্পমেয়াদি কিছু বিক্ষিপ্ত প্রয়াস পেরিয়ে ট্রাম পেল তার চূড়ান্ত চালিকাশক্তিকে : বিদ্যুৎ। সেপ্টেম্বর, ১৮৮০ নাগাদ সেন্ট পিটার্সবার্গে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম ছুটতে শুরু

ট্রাম : ১৮৯৯ (চৌরঙ্গি)

ট্রাম : ১৯৪০

করে। এইসময় কলকাতা শহরের অভিভাবকরা এখানে ঘোড়ায় টানা ট্রামের দ্বিতীয় পর্যায়কে নির্বিঘ্ন করতে ব্যস্ত। এই পর্বের সাফল্য এবং জনপ্রিয়তার কারণে অন্তত এক দশক বিকল্প কোনও ব্যবস্থা খোঁজার কোনও প্রশ্নই ওঠেনি। অথচ এই সময়েও কলকাতার প্রচণ্ড গরমে ভারবহন করতে গিয়ে বিদেশি বহুমূল্য ঘোড়ার নিয়মিত মৃত্যুতে মানবিক ও ব্যবসায়িক ধাক্কা লাগছিল বিলক্ষণ। শেষ পর্যন্ত ট্রাম কোম্পানি তাদের বোধোদয় প্রকাশ্যে ঘোষণা করল ১৮৯৮ সালে : বিদ্যুতে না চালালে কলকাতার বুকে ট্রাম চালানো আর ব্যবসায়িকভাবে সম্ভব হচ্ছে না।

তাদের এই বিশ্বাসের পেছনে একটি কারণ পৃথিবীর নানা অংশে বৈদ্যুতিক ট্রামের সাফল্য। তবে সবচেয়ে জোরালো কারণটি স্থানীয় : ১৮৯৬ সালে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী সংস্থা কিলবার্ন অ্যান্ড কোম্পানি ইমামবাগ লেনে (এখনকার প্রিন্সেপ স্ট্রিটে) প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করেছে। ১৮৯৯ সালে কলকাতায় বিদ্যুৎ এসেছিল। তার আগেই এই কিলবার্ন কোম্পানি আর ট্রাম কোম্পানি যৌথভাবে কলকাতা কর্পোরেশনের কাছে বিদ্যুৎ-চালিত ট্রাম চালানোর প্রস্তাব পেশ করল। কিন্তু প্রস্তাব অনুমোদন আর বাস্তবায়নের মাঝে অনেক অর্থ, শ্রম, সময় ব্যয়ের বাধ্যবাধকতা। কর্পোরেশন এক্ষেত্রে আশাতীত তৎপরতার পরিচয় দিল। প্রস্তাব পেশের মাস কয়েকের মধ্যে, জানুয়ারি ১৮৯৭, চেয়ারম্যান এইচ. সি. উইলসন এবং ভাইস চেয়ারম্যান নীলাম্বর মুখার্জির পরিচালনায় এক জরুরি অধিবেশনে কলকাতায় বৈদ্যুতিক ট্রামকে প্রশাসনিকভাবে স্বাগত জানানো হল; বোঝা গেল এই কর্মযজ্ঞে কলকাতা কর্পোরেশন দায়িত্বপালনে আগ্রহী এবং কৃতসংকল্প।

প্রসঙ্গত, এই নীলাম্বর মুখার্জি (১৮৪২-১৯২০) পূর্বে কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি এবং পরে সেখানকার প্রধানমন্ত্রী হন, ১৮৮৬ সালে অবসর গ্রহণের আগে পর্যন্ত সেই দায়িত্ব সামলান। আজকে ব্যক্তি নীলাম্বর অপেক্ষা বেলুড়ের গঙ্গাতীরবর্তী তাঁর বাগানবাড়িটি বেশি পরিচিত : বেলুড়ের বর্তমান ঠিকানায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ১৮৯৮-৯৯ সালে প্রায় সাড়ে দশ মাস এই বাড়িতেই ছিল রামকৃষ্ণ মঠ; শ্রীমা সারদাও ১৮৮৮ এবং ১৮৯৩-৯৪ সালে বেশ কিছুকাল করে বাড়িটিতে বাস করেছেন।

ফিরে আসি ট্রামের কথায়। ১৯০০ সাল থেকে রাস্তার ন্যারোগেজ বদলে চার ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি চওড়া ট্রামলাইন পাতা শুরু হয়; সেই সঙ্গে মাথার ওপরে বৈদ্যুতিক তার খাটানোর ব্যবস্থা। কর্পোরেশনের সক্রিয় সহযোগিতা পেয়ে ট্রাম কোম্পানি ও কিলবার্ন কোম্পানি যৌথ তৎপরতায় টার্গেট-দিনের প্রায় সাড়ে আট মাস আগে সবকিছু প্রস্তুত করে ফেলল। ২৭ মার্চ ১৯০২ কলকাতার বুকে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রামের দৌড় শুরু হল চৌরঙ্গী

ট্রাম : ১৯৪৪ (ধর্মতলা টার্মিনাস)

থেকে খিদিরপুর রুটে, ময়দানের সবুজ ছুঁয়ে ছুঁয়ে। রসিক মানুষরা বললেন, এতকাল ট্রাম চলছিল হর্সের পাওয়ারে, এবার চলবে 'হর্সপাওয়ার'-এ।

উদ্বোধনের মাস কয়েক যেতে না যেতে ১৪ জুন ১৯০২ থেকে বৈদ্যুতিক ট্রাম পৌঁছে গেল কালীঘাটে। তারপর ওয়েলিংটন থেকে বউবাজার হয়ে ডালহৌসি স্কোয়ার, ধর্মতলা অবধিও। বছর ঘোরার আগেই, সরকারি নথি থেকে মনে হচ্ছে ১৯ নভেম্বর ১৯০২-এর মধ্যে সব কটি রুটেই বৈদ্যুতিকরণ হয়ে গেল। এবার বিদ্যুতের শক্তিতে ভর করে ১৯০৩ থেকে ১৯০৮ ট্রাম তার ঘন্টি বাজাতে বাজাতে পৌঁছে যেতে লাগল কলকাতার নতুন নতুন গন্তব্যে : টালিগঞ্জ, বেলগাছিয়া, বাগবাজার, হ্যারিসন রোড, লোয়ার সার্কুলার রোড, আলিপুর, বেহালা।

শুধু কলকাতা কেন? বৈদ্যুতিক ট্রাম চলে গেল হাওড়া শহরের নানা প্রান্তেও। নোনাপুকুর থেকে এল হাওড়া পনটুন ব্রিজ অবধি। সেই ব্রিজের ওপর দিয়ে ট্রাম চলা সম্ভব নয়। তাই গঙ্গার ওপারে পৃথকভাবে বসানো হল ট্রামলাইন। হাওড়া স্টেশন থেকে দুটি রুট চালু হল : একটি উত্তর দিকে ডবসন রোড হয়ে বাঁধাঘাট, আর একটি দক্ষিণে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে শিবপুর। হাওড়ার ট্রাম বগিগুলির জন্য ডিপো তৈরি হল ঘাসবাগানে।

১৯০০ সালে ঘোড়ায় টানা ট্রামের জন্য কলকাতার বুকে ট্রামলাইন পাতা ছিল ৩০.৫ কিমি.। কিন্তু যাত্রীদের বিপুল চাহিদা মেটাতে ১৯১৪ সালে এই দৈর্ঘ্য বেড়ে হল ৪৮.৩ কিমি.। ১৯০৯ সাল থেকে জনসাধারণের বাহন হিসেবে বাস এবং ট্যাক্সির প্রচলন হতে শুরু করলেও ট্রামের আধিপত্যে কোনও ভাঁটা আসেনি। বরং ট্রামের জনপ্রিয়তার ধাক্কায় আদ্যিকালের বাহনগুলি কেমনভাবে মুখ লুকোতে বাধ্য হচ্ছিল তার এক পরিসংখ্যান উদ্ধার করেছেন সুভাষ সমাজদার তাঁর 'কলকাতা কলহকথা' গ্রন্থে : ১৯০৩-০৪, ১৯০৪-০৫ আর ১৯০৫-১৯০৬ পরপর এই তিন আর্থিক বছরে ঘোড়ার গাড়ির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬১৭, ৪৭৯ ও ১১৩; এই তিন বছরে পালকির নিম্নমুখী সংখ্যা যথাক্রমে ২৪৬, ২৪০ আর ২১২।

বৈদ্যুতিক ট্রামের অব্যাহত জয়যাত্রার আর একটি পরিসংখ্যান পাওয়া যায় অমরেন্দ্র দাস প্রণীত 'এই শহরের ইতিকথা কলকাতা' গ্রন্থে : ১৯৩৯ সালে কলকাতা ও হাওড়া মিলিয়ে ১০ কোটি ৬৪ লক্ষ যাত্রী ট্রামে যাতায়াত করেছিলেন, ১৯৫০ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হল ৩২ কোটি ৪৩ লক্ষ, ১৯৫২ সালে ৩৮ কোটি ৩৭ লক্ষ, ১৯৫৭ সালে ৪০ কোটি ১৯ লক্ষ।

শুকনো সংখ্যাতত্ত্বের কথা থাক। বাস, ট্যাক্সি পুরোদমে চালু হয়ে গেলেও বৈদ্যুতিক ট্রামের প্রতি সাধারণ মানুষের টান বুঝতে কবি অজিত দত্তের 'নইলে' কবিতায় চোখ বোলাই :

''প্যাঁচ কিছু জানা আছে কুস্তির?
ঝুলে কি থাকতে পার সুস্থির?
নইলে
রইলে
ট্রাম না চড়ে,

ভ্যাবাচাকা রাস্তায় পড়ে বেঘোরে।”

অর্থাৎ চাহিদা-সরবরাহের সুষ্ঠু ভারসাম্যকে মূলধন করে, কলকাতার ট্রামের জয়যাত্রা দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল, দীর্ঘকাল অচঞ্চল ছিলেন ট্রাম কোম্পানির লক্ষ্মী।

হাওড়া ব্রিজের কাছে ট্রাম, ১৯৪৫

ভাঁটার গভীর টান

অবিরত উন্নতির যা অনিবার্য পরিণতি, কলকাতা ট্রামের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। ১৯৬০-এর দশক থেকেই তার অধোগতির শুরু। এই অধোগতির সঙ্গে কলকাতা ট্রামের জাতীয়করণের সময়কালের প্রায় সমাপতন ঘটায় অনেকেই প্রশাসনের অদূরদর্শিতা, সদিচ্ছার অভাব, দুর্নীতি ইত্যাদিকে কলকাতা ট্রামের দুর্গতির কারণ হিসেবে দাগিয়ে দিতে চান। ব্রিটিশ ট্রাম কোম্পানির কর্মকুশলতার সাপেক্ষে বিচার করলে সেই যুক্তিগুলিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু ট্রাম পরিষেবা চালানোর অন্য প্রতিকূলতাও দানা বাঁধছিল, যেগুলি অনেক গভীর এবং সার্বিক।

১৯৩০-এর দশকের প্রথম দিকে কানপুর শহর ট্রাম পরিষেবা তুলে দিল। ভারতবর্ষে ট্রামের দরজা বন্ধ হওয়ার সেই শুরু। ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি একে একে ট্রাম উঠিয়ে দেওয়া হল চেন্নাই, দিল্লি আর মুম্বই শহরে। গোটা পৃথিবী জুড়েই অটোমোবাইল প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতির কারণে মন্থরগতির ট্রামকে সেকেলে অচল এক বাহন হিসেবে দেখা হতে লাগল।

এর সঙ্গে যোগ হল কলকাতা ট্রামের স্থানীয় কিছু প্রতিবন্ধকতা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই সন্দিগ্ধ ব্রিটিশ কোম্পানি এখানে বিনিয়োগে রাশ টানতে আরম্ভ করে। ফলে ট্রামলাইন, মাথার ওপরের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, বগি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ঘটতে থাকে। দেশভাগের কারণে উদ্বাস্তু মানুষের স্রোত অনেক চওড়া রাস্তাকে জনসমাকীর্ণ করে দেয়; রাস্তা ঘিঞ্জি হতে থাকে বাস-ট্যাক্সি-গাড়ি ইত্যাদির ক্রমবর্ধমান সংখ্যাতেও। ট্রামের নিজস্ব ইস্পাত-লাইনের ওপর অন্য যানবাহন উপচে চলে এসে তার গতি রুদ্ধ করছে, কিন্তু অভিযোগ উঠছে ট্রামের বিরুদ্ধেই : চওড়া রাস্তার অনেকটা অধিকার করে নেওয়ার অভিযোগ। বোঝা গেল, কলকাতা ট্রামকে এবার ক্রমশ পাততাড়ি গোটাতে হবে।

সেই গোটানোর কাজ শুরু হল হাওড়া থেকে। সেখানের অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ রাজপথে ট্রাম যানজট সৃষ্টি করছে, এই যুক্তিতে বাঁধাঘাট এবং শিবপুর উভয় রুটই বন্ধ করে দেওয়া হল। ঘাসবাগান ট্রাম ডিপো বাতিল গাড়ি ফেলবার জন্য ঝোপঝাড়ে আকীর্ণ এক জমিতে পরিণত হল।

হাওড়ার মতো সম্পূর্ণ নির্বাসনে পাঠানো হল না মূল কলকাতার ট্রামকে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে না পারার রুগ্নতা স্পষ্ট হতে থাকল ট্রাম

ব্যবস্থায়, যাত্রীরাও খুব দ্রুত মুখ ফেরাতে লাগলেন তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় এবং অভিজাত এই পরিবহনটি থেকে। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত শংকরের জনপ্রিয় উপন্যাস (১৯৭৬ সালে সত্যজিৎ রায় দ্বারা চলচ্চিত্রায়িত) 'জন অরণ্য'-এর শুরুতে আমরা একটি অনুধাবনযোগ্য দৃশ্য দেখি : ''রিকশা, ঠেলাগাড়ি, বাস, লরি, ট্যাক্সি এবং টেম্পোর ভিড়ে চিৎপুর রোডে ট্র্যাফিকের গোলমেলে জট পাকিয়েছে। এরই মধ্যে একটা পুরনো ট্রামের বৃদ্ধ ড্রাইভার লালবাজার থেকে বেরিয়ে বাগবাজার যাবার উৎকণ্ঠায় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজাচ্ছে! সোমনাথের মনে হল প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক জরাগ্রস্ত বিশাল গিরগিটি নিজের নিরাপদ আশ্রয় থেকে বিতাড়িত হয়ে কেমনভাবে কলকাতার এই জন-অরণ্যে পড়ে কাতর আর্তনাদ করছে।''

এই ১৯৭০-এর দশকেই দুই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে 'প্রাগৈতিহাসিক যুগের' ট্রামকে বর্তমান যুগ আবার সোৎসাহে আহ্বান জানাল। এক, পেট্রলের দামের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতি। আর দুই, বায়ুদূষণমুক্ত ট্রামের প্রতি পরিবেশ সচেতনতা অভিযানের পক্ষপাতিত্ব। এই দশকের শেষের দিকে শিয়ালদহ ফ্লাইওভার নির্মাণের সময় নতুন উৎসাহে পাতা হল ট্রামলাইন। নির্মাণবিদরা জানালেন, বিশ্বের খুব কম ফ্রাইওভারেই ট্রাম চলে।

আবার প্রায় এই সময়েই শুরু হল কলকাতায় মেট্রো রেলের কাজ। কাজ হত 'কাট অ্যান্ড কভার' পদ্ধতিতে, অর্থাৎ মাটি কেটে সুড়ঙ্গ তৈরি করে মাটি চাপা দেওয়া হত। এ এক অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ কাজ, তাছাড়া যতদিন কাজ হত রাস্তার সংশ্লিষ্ট অংশ বন্ধ রাখা ছাড়া উপায় থাকত না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোপ পড়ত ট্রামলাইনের ওপর। তাছাড়া যে-বাহনের পথ তৈরি করার জন্য ট্রামলাইনের ওপর কোপ পড়ছে সেই মেট্রো রেল ব্যবস্থার প্রধান ইতিবাচক দিক এটি ট্রামের মতো প্রায় বায়ুদূষণ মুক্ত, তার সঙ্গে বাড়তি লাভ তার দুরন্ত গতি।

দ্রুতি-লোভাতুর কলকাতা তাই আর ট্রামের দিকে ফিরে তাকায় না। শহরে অবস্থিত ছটি ট্রামডিপোর মধ্যে এখন তাই দুটি চালু আছে। বেলগাছিয়া ও টালিগঞ্জ ট্রামডিপোর জমি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। ১১৬ কিমি. ট্রামলাইন কমতে কমতে এখন ৩৩ কিমি.। ১৯৬০-এর দশকে যেখানে কলকাতা ট্রামের ৩৭টি রুট চালু ছিল, এখন সেখানে নিয়মিত ট্রাম চলে সাকুল্যে দুটি বা তিনটি রুটে (২৪।২৯ এবং ২৫)। সেখানকার জনবহুল, যানবহুল রাস্তায় আটকে গিয়ে শ্রান্ত ট্রাম যখন কাতরভাবে টিং টিং ঘণ্টি মারে তখন তার মধ্যে কোনও আত্মবিশ্বাসী আহ্বান থাকে না, মনে হয় বুঝি কলকাতা ট্রামের বিদায়ঘণ্টা শুনছি।

তবু কলকাতার ট্রাম

অথচ পর্যটকদের জন্য গাইড-বইতে, বা আন্তর্জালের তথ্যভাণ্ডারে কলকাতার ঐতিহ্য বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গেলে ট্রামের কথা আসবেই। ট্রাম ছিল দীর্ঘ কয়েক দশক জুড়ে কলকাতার সবচেয়ে সমাদৃত পরিবহন ব্যবস্থা। এখনও বহু প্রবীণের সুখস্মৃতিচারণে ট্রামের অনিবার্য আনাগোনা।

শুধু কলকাতার নিত্যিকার রুটিন দিনযাপনে নয়। অনেক আবেগ-আন্দোলনের ক্ষণেও ট্রাম যেন এক জীবন্ত চরিত্র হয়ে সামিল হয়েছে। ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ মুসলিম লিগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়। তখন শহরবাসীর কাছে সম্প্রীতির জরুরি বার্তা দিতে ট্রাম কর্মীদের প্রতীকী ধর্মঘট এক বহু প্রশংসিত পদক্ষেপ। ব্রিটিশ ট্রাম কোম্পানি ২৫ জুন ১৯৫৩ ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণির ভাড়া এক পয়সা বাড়ানোয় যে-আগ্রাসী আন্দোলন হয়েছিল তা নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে এতটা সময়ের দূরত্বে দাঁড়িয়ে সমর্থন করা যাবে না। কিন্তু উপরতলার অন্যায়

সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাগী কলকাতার সে এক বেপরোয়া প্রতিবাদ।

বেপরোয়া আশাবাদের কথাও বলা দরকার। ট্রাম বাঁচানোর নানা অসংবদ্ধ উদ্যোগকে দানা বাঁধাতে সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন জনৈকা নাগরিক। সেই মামলার সূত্রে ২১ জুন, ২০২৩ মাননীয় প্রধান বিচারপতি কলকাতা ট্রামের এই দুরবস্থাকে 'দুর্ভাগ্যজনক' আখ্যা দিয়েছেন। আদালত রাজ্য সরকারকে ট্রাম রক্ষায় আধিকারিক, বিশেষজ্ঞ ও উৎসাহী নাগরিকদের নিয়ে এক কমিটি গড়ার পরামর্শ দিয়েছে। অন্তত পর্যটকদের আকর্ষণের কথা ভেবেও 'হেরিটেজ' তকমার যোগ্য এই বাহনটিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত, আদালত এমনই অভিমত প্রকাশ করেছে। প্রধান বিচারপতি টি. এস. শিবগণনম এক নতুন ভাবনা যোগ করেছেন : "হেরিটেজ রক্ষার দায়িত্ব সরকারের। দুর্গাপূজা ইউনেসকোর তরফ থেকে হেরিটেজ তকমা পাওয়ায় রাজ্যের মানুষ যেমন গর্বিত, ট্রাম মসৃণভাবে, আধুনিকতার সঙ্গে চললেও মানুষ গর্ববোধ করবেন।"

কলকাতার নিজস্ব শোকও জড়িয়ে আছে তার ট্রামের সঙ্গে—তার প্রধান এক কবির মৃত্যুশোক। সেদিন ১৪ অক্টোবর ১৯৫৪। কথাসাহিত্যিক শাহদুজ্জামান তাঁর জীবনীমূলক উপন্যাস 'একজন কমলালেবু'-তে পুনর্নির্মাণ করেছেন সেই দুর্ঘটনা। আমরা তাঁকে অনুসরণ করি : পুরনো শতাব্দীর ধুলোমাখা একটা সরীসৃপের মতো কলকাতা বালিগঞ্জ ডাউন ট্রাম ঘন ঘন ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের দিকে। চারদিকে তখন শেষ বিকেলের রোদ। একজন হেঁটে যাচ্ছেন ওই ট্রামের দিকেই। ট্রাম এগিয়ে আসছে, সেই মানুষটিও এগিয়ে যাচ্ছেন ট্রামলাইনের দিকে। ট্রামের ড্রাইভার জোরে জোরে ঘণ্টা বাজালেন, চিৎকার করে ডাকলেন, তবু সে-মানুষ উঠে গেলেন ট্রামলাইনের ওপর এবং আটকে গেলেন ট্রামের ক্যাচারে। সশব্দে ব্রেক কষল ট্রাম।... মানুষটিকে টেনে বার করে এনে দৌড়ে আসা লোকজন জানতে চাইলেন, কী নাম আপনার, কোথায় থাকেন? রক্তাক্ত সেই মানুষটি বললেন, আমার নাম জীবনানন্দ দাশ, ওই ল্যান্সডাউন রোডে থাকি, ১৮৩ নং বাড়ি।

সেখানে উপস্থিত কে-ই বা জানত, এই মানুষটিই তাঁর 'ফুটপাথে' কবিতায় লিখেছেন, "অনেক রাত হয়েছে—অনেক গভীর রাত হয়েছে/ কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—/ কয়েকটি আদিম সর্পিণী সহোদরার মতো/ এই যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে/ পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে এদের বিষাদ বিস্বাদ স্পর্শ/ অনুভব করে হাঁটছি আমি।"

কলকাতা ট্রামেরও বুঝি তার কবির মতোই অবস্থা : সম্ভাবনাময় ভোর, দৃপ্ত দুপুর, স্বর্ণালি সন্ধ্যা পেরিয়ে তার জীবনেও 'অনেক রাত হয়েছে—অনেক গভীর রাত হয়েছে'।

সামনে শুধু অবশ্যম্ভাবী সমাপ্তির অপেক্ষা। তবু নিশ্চিত থেকে যাবে বহু অনপনেয় উজ্জ্বল স্মৃতি, কত বিরল সম্মানের সাক্ষ্য, কিছু নাছোড় আশাবাদীর উদ্দীপ্ত স্বপ্নবুনন। কলকাতা কখনও তার ট্রামকে ভুলতে পারবে না। তাই কলকাতা ট্রামের মৃত্যু নেই। ✠

তথ্যসূত্র

আন্তর্জালের নানা প্রাসঙ্গিক সাইট এবং

১। সুভাষ সমাজদার, *কলকাতা কলহকথা*, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯০

২। অমরেন্দ্র দাস, *এই শহরের ইতিকথা, কলকাতা*, শ্রীগুরু পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯০

৩। শ্রীপান্থ, *কলকাতা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯

৪। পূর্ণেন্দু পত্রী, *কলকাতা সংক্রান্ত*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪